মাহমুদুল হকের উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধ

কামরুন নাহার*

[সারসংক্ষেপ : ১৯৪৭ পরবর্তীকালের একজন বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক মাহমুদল হক। বাংলা কথাসাহিত্যে তাঁর আবির্ভাব অত্যন্ত গুরুত্ববহ। কারণ, তাঁর সৃজনপ্রয়াস বাংলা কথাসাহিত্যে সংযোজিত করেছে নতুন চিন্তা ও নির্মাণসৌন্দর্য। বিষয়চেতনা, ভাবঋদ্ধতা, ভাষার বয়নকৌশল এবং সর্বোপরি অভিনব উপস্থাপনায় তিনি যে স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন, কালান্তরে তা আজও ভাস্বর। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-উত্তর কালে বাংলা কথাসাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যখন অনিবার্যভাবে জায়গা করে নিতে থাকে, মাহমুদুল হকের চৈতন্যলোকও তার থেকে নিস্পৃহ থাকতে পারেনি। মুক্তিযুদ্ধের অবিনাশী সুর-শব্দ তাঁর কথাসাহিত্যে জীবন্ত হয়ে ওঠে নতুন মাত্রা নিয়ে। *জীবন আমার বোন* (১৯৭৬), *খেলাঘর* (১৯৯৮) এবং *অশরীরী* (২০০৪)– উপন্যাসগুলো তারই সাক্ষ্য বহন করে। বর্তমান প্রবন্ধে মাহমুদুল হকের এ উপন্যাসগুলো বিশ্লেষণ করে মুক্তিযুদ্ধের বহুমাত্রিক অভিঘাতে ব্যক্তির মনোলোকে দেশ-কাল-রাজনীতি ও যুদ্ধের চেতনার স্বরূপ নির্ণয় এবং তা প্রকাশে ঔপন্যাসিকের স্বাতন্ত্র্য নির্দেশের প্রয়াস রয়েছে।]

বিষয়শ্রেণির বিচারে মাহমুদুল হকের উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধ একটি উল্লেখযোগ্য ধারা। রক্ত, অশ্রু, দ্রোহ ও মুক্তি এবং ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের নানামাত্রিক দ্বান্দ্বিকতার সমন্বয়ে বাংলাদেশের গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধ তাঁর উপন্যাসে উপস্থিত হয়েছে সূক্ষ্মকোণে আলো ফেলে। মাহমুদুল হকের *জীবন আমার বোন* (১৯৭৬), *খেলাঘর* (১৯৯৮) এবং *অশরীরী* (২০০৪) উপন্যাসত্রয়ের বিষয়বস্তু বাংলাদেশের এই গৌরবময় অধ্যায় তথা মুক্তিযুদ্ধ। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার, তিনটি উপন্যাসই পত্র-পত্রিকায় প্রকাশের অনেক কাল পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়। ১৯৭২ সালে রচিত উপন্যাস *জীবন আমার বোন* প্রথম প্রকাশ পায় ১৯৭৩ সালে, *খেলাঘর* উপন্যাসের রচনা ও প্রকাশকাল দুই-ই ১৯৭৮ সাল এবং *অশরীরী* উপন্যাস প্রথম পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৯৭৯ সালে। অর্থাৎ রচনাকালের বিচারে তাঁর মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক তিনটি উপন্যাসের কালগত ব্যাপ্তি আট বছর। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার এবং দেশ স্বাধীন হওয়ার পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যেই মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা ও বিষয়সমৃদ্ধ তাঁর তিনটি উপন্যাস বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে।

আলোচ্য তিনটি উপন্যাসই মুক্তিযুদ্ধাশ্রিত হলেও বৈচিত্র্যহীন নয়। *জীবন আমার বোন* উপন্যাসের পরিসর তৈরি হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ-প্রাক্কালীন কাহিনি অবলম্বনে। যুদ্ধশেষের সংবাদটি উপন্যাসে পাওয়া গেলেও উপন্যাসের মূল আখ্যানের সঙ্গে তার সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ নয়। *খেলাঘর* উপন্যাসটিকে বলা যায় সরাসরি যুদ্ধদিনের প্রেক্ষিতনির্ভর উপন্যাস, যেখানে রাজধানী ঢাকা শহরের আক্রান্ত হওয়া, লোকজনের আশ্রয়-অভিমুখে ছোটা এবং অবরুদ্ধ হয়ে পড়া এইসব বিষয় প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। *অশরীরী* উপন্যাসটিতে স্মৃতির প্রেক্ষাপটে উঠে আসে ভয়ংকর যুদ্ধের ততোধিক ভয়ংকর পাকিস্তানি ক্যাম্পে বাঙালি নির্যাতনের কাহিনি। সব মিলিয়ে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের একটি সামগ্রিক পটভূমি আমরা দেখতে পাব মাহমুদুল হকের

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়।

উপন্যাসে। ইতিহাস এখানে বাঙালি জাতিসত্তার মর্মকে স্পর্শ করে আক্রমণ এবং প্রতিরোধের বাস্তবতাকে হাজির করেছে। মাহমুদুল হকের উপন্যাসে প্রতিরোধ ব্যক্তি এবং সমষ্টি উভয়ের। যুদ্ধের চিত্রণের মধ্য দিয়ে বাস্তবতার এক চরম পরিস্থিতিকে তুলে ধরেন ঔপন্যাসিক।

মাহমুদুল হকের *জীবন আমার বোন* উপন্যাসটি পাঠ করে কথাশিল্পী রশীদ করীম তাঁর লিখিত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন– 'আবার এই মাত্র পাঠ করে উঠলাম তাঁর আর একটি উপন্যাস *জীবন আমার বোন*। পুনর্বার প্রমাণ পেলাম, চিনতে আমার ভুল হয়নি, সত্যিই একজন শক্তিশালী লেখকের, আবির্ভাব ঘটেছে, আমাদের মধ্যে' (রশীদ, ২০০৩ : ৮৮)। রশীদ করীম তাঁর প্রবন্ধে একদিকে যেমন *জীবন আমার বোন* উপন্যাসের আঙ্গিক-ভাষা নিয়ে আলোচনা করেছেন, অন্যদিকে উদ্‌ঘাটন করেছেন এর কেন্দ্রীয় চরিত্র-নির্মিতি খোকার অনন্যতাকে। একটি উপন্যাস একটি ব্যাপ্ত ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে পুনর্লিখন করে না, করে পুনঃসৃজন– *জীবন আমার বোন* সেই পুনঃসৃজন। উপন্যাসটি ইতিহাসনির্ভর, কিন্তু এর কোনো চরিত্রই ঐতিহাসিক নয়– সকলেই সাধারণ মানুষ, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির প্রতিনিধি। মাহমুদুল হক তাঁর উপন্যাসটিকে ইতিহাসের সমান্তরালে রেখে ১৯৭১ সালের পূর্ব ও পরের কালপরিধিকে বিচার করেছেন। সেটা করতে গিয়ে তিনি প্রথমত, ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিতে সেই সময়টাকে দেখেছেন এবং দ্বিতীয়ত, একজন সচেতন নাগরিকের মানসপ্রেক্ষিত থেকে বিচার করেছেন মুক্তিযুদ্ধের কারণ ও ফলাফলকে। তাই উপন্যাসটি কেবল কাহিনি নয়, সংলাপনির্ভর তর্ক-বিতর্কও নয়– হয়ে উঠেছে ইতিহাস-অন্বেষাও।

জীবন আমার বোন উপন্যাসটির রচনাকাল ১৯৭২ সাল। মুক্তিযুদ্ধের ঠিক পরপর লেখা উপন্যাসটি তাই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধাশ্রিত প্রথম দিককার উপন্যাসগুলোর মধ্যে অন্যতম। যুদ্ধের বছরখানেকের মধ্যে লেখা বলে ঔপন্যাসিকের অভিজ্ঞতা ও স্মৃতি দুটি অবলম্বনই সজীব। মুক্তিযুদ্ধ তখনও তাঁর জন্য সাম্প্রতিক ঘটনা। মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার কয়েকদিন আগেকার ঘটনা উপন্যাসটির মূল আখ্যানভাগ গড়ে তুলেছে। সারা দেশে তখন আলোড়ন– মিছিল, মিটিং আর উত্তেজনায় কম্পমান শহর-গ্রাম। প্রত্যক্ষ যুদ্ধের আসন্নতা বাঙালির জীবনে সেই প্রথম। যুদ্ধ সম্পর্কিত জিজ্ঞাসায় উদ্বেল সকল মানুষ– বিত্তহীন, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত সকলেই যুদ্ধ বিষয়ে সচেতন স্ব-স্ব শ্রেণির অবস্থান থেকে। খোকা ওরফে জাহেদুল কবির উপন্যাসের নায়ক। গোটা উপন্যাসের আবর্তন তাকে ঘিরে। তার বোন রঞ্জু উপন্যাসের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। খোকা মুক্তিযুদ্ধকে দেখে খুব কাছে থেকে যদিও যুদ্ধে সে যোগ দেয় না।

জীবন আমার বোন উপন্যাসের প্রেক্ষাপট আবর্তিত হয়েছে ঢাকা শহরকে কেন্দ্র করে। কিন্তু ঢাকার সীমানাকে আশ্রয় করে ঔপন্যাসিক সমগ্র দেশের যুদ্ধ-বাস্তবতাকে হাজির করতে সক্ষম হয়েছেন। যুদ্ধ হত্যা-মৃত্যুর এক অবশ্যম্ভাবী কারণ। ঢাকা শহরে বাস-করা খোকার সেই মৃত্যু-অভিজ্ঞতা হয়ও। তবে খোকার জীবন করুণ মৃত্যুর স্মৃতি বয়ে বেড়াচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ শুরুর বহু আগে থেকে। শৈশবে মামাবাড়ির পুকুরে ডুবে মারা যায় তার দুই বোন অঞ্জু ও মঞ্জু। খোকা তার মৃত বোনদুটিকে কখনও বিস্মৃত হতে পারে না। বোনদের মৃত্যুর স্মৃতি খোকাকে প্রায়শ কাতর ও বিষণ্ন করে দেয়। মুক্তিযুদ্ধের আলোড়ন খোকার মধ্যে জাগায় প্রচণ্ড তোলপাড়। কিন্তু পুরো যুদ্ধটাকে খোকা পর্যবেক্ষণ করে খানিকটা নিরাবেগ-তর্কপ্রবণ দৃষ্টিতে। যুদ্ধ যে বাঙালির জন্য অনিবার্য পরিণাম তাতে খোকার যেন কোনো সন্দেহ থাকে

না। তার মনে হয় ইতিহাসের পরম্পরা বেয়ে বাঙালি সঠিক জায়গাতেই পৌঁছেছে, কিন্তু যুদ্ধের প্রকৃতি নিয়ে তার মধ্যে সৃষ্টি হয় দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্বটাকে সে নিজের মনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে না, তার চারদিককার মানুষজনের মধ্যে সে তা সঞ্চারিত করতে চায়। এর ফলে সৃষ্টি হয় আরও এক দ্বান্দ্বিকতা– যুদ্ধ বিষয়ে বাদ-বিসংবাদ। মুক্তিযুদ্ধের মাত্র দুই বছর আগে ১৯৬৯-এর গণ-আন্দোলনের ফলে যে-প্রচণ্ডতার জোয়ার জাগে, তা শোষিত-নিপীড়িত বাঙালি জাতির সামনে এক নতুন রাজনৈতিক সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। খোকাও সেই আলোড়নে স্পৃষ্ট হয়। তথাপি খোকার মধ্যে লক্ষ করা যায় এক ধরনের রাজনীতিবিমুখতা, যা খোকা চরিত্রটিকে নিয়ে যায় ভিন্ন খাতে। মাহমুদুল হকের খোকা চরিত্রটি বাস্তব শ্রেণিমানসিকতাকে আশ্রয় করে এখানেই মোচড় খায় এবং *জীবন আমার বোন* উপন্যাসটিকে দ্বন্দ্বপূর্ণ করে তোলে। খোকার প্রেক্ষণবিন্দু উপন্যাসটির একটি কেন্দ্রীয় দিক। কেননা, খোকার ভাবনা ও কর্মের ফলস্বরূপ এগিয়ে যায় উপন্যাসের কাহিনি।

জীবন আমার বোন উপন্যাস একটি সমান্তরাল যাত্রার উপন্যাস– এক রেখায় খোকা ও মুক্তিযুদ্ধ এবং অন্য রেখায় অপর চরিত্রবর্গ ও মুক্তিযুদ্ধ। খোকাকে ব্যতিক্রমও বলা চলে যখন আমরা এ-সংবাদ পাই যে সে সচেতন নাগরিক হয়েও নাম তোলেনি ভোটার লিস্টে। যখন সারা দেশ, দেশের সমস্ত মানুষ প্রচণ্ডতা নিয়ে ফেটে পড়বার উত্তেজনায় স্পন্দমান তখন শিক্ষিত শ্রেণির মানুষ খোকার মধ্যে পরিলক্ষিত হয় নিস্পৃহতা-উদ্যমহীনতা– 'দেশ, দেশের কল্যাণ, দেশের ভবিষ্যৎ, দেশপ্রেম, এসবের মাথামুণ্ড কিছুই তার মগজে ঢোকে না। এইসব ভজগট ব্যাপারে নিরর্থক অপচয়িত না হয়ে বরং শিথিল আলসেমির ভিতর ডুবে থাকা ঢের ভালো, অন্তত নিরাপদ তো বটেই। রিকশার হাওয়া ছেড়ে দেওয়া, বাসে আগুন ধরানো, পুলিশের গায়ে ইট মারা, দেশের প্রতি নিজের প্রগাঢ় অনুরাগকে তুলে ধরার এতো অসংখ্য তীব্র ও আকর্ষণীয় পথ চারপাশে ছড়ানো থাকলেও কখনোই সে সুনিশ্চিত কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারে না, আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা তার হাত-পা' (মাহমুদুল, ২০০৫ : ২০)। এই যে খোকার সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারার সত্য, তার আত্মবিভোর নির্লিপ্ততার স্বভাব এসবই যুদ্ধে তার অবস্থানের ভঙ্গুরতাকে প্রকাশ করে। ঔপন্যাসিক খোকার চরিত্রটিকে বাংলাদেশের শ্রেণিবাস্তবতার নিরিখে নির্মাণ করেছেন বলেই খোকার সত্তার মধ্যকার টানাপোড়েনটাকে দেখাতে পেরেছেন। খোকা উপন্যাসে একটি চরিত্র হলেও সে একটি উল্লেখযোগ্য মানুষের প্রতিনিধি। খোকা এবং তার মতো মানুষেরা সমাজে দুর্লভ নয়। যুদ্ধ এলেই যে তারা বদলে গিয়ে রূপান্তরিত নতুন সত্তায় ধরা দেবে তা নয়। তার মতো মানুষেরা সমাজবদ্ধ হয়েও অন্তরে বিচ্ছিন্নতার ধারক। সমালোচকের ভাষায়–

> কেবল দেশ আর জনতা নয়, খোকা তার অন্তর্গত সত্তা থেকেই বিচ্ছিন্ন। সত্তাবিচ্ছিন্নতা তাকে নিয়ে গেছে বিযুক্তির চরম অতলে। সে এড়িয়ে চলে মানুষ, বিরক্ত হয় আত্মীয়স্বজন-দর্শনে। একলা-আমির ভুবনে অধীশ্বর থাকতেই তার যত আনন্দ। মার্চের উত্তুঙ্গ মুহূর্তও ভাঙতে পারে না তার এই অটল নিঃসঙ্গতা। (বিশ্বজিৎ, ২০১১ : ২৫)

ব্যক্তি ও তার মনস্তত্ত্ব যখন জটিল থেকে জটিলতর বলয়ে আটকা পড়ে, তখন তার উদ্ধার দুরূহ হয়ে দাঁড়ায়। খোকার মধ্যে লেখক তেমনি এক সত্তার উপস্থিতি দেখতে পান। সমাজে এরকম ব্যক্তিরাই বিচ্ছিন্নতার ইতিহাস রচনা করে এবং বৃহত্তর সামাজিকতার আহ্বানও অনেক সময় তাদের নির্বিকারত্ব এবং বিযুক্ততায় ভাঙন ধরাতে পারে না। মুক্তিযুদ্ধের তীব্রতা একটা পর্যায়ে উত্তুঙ্গ অবস্থানে পৌঁছে গিয়ে খোকার মতো যুবকদের প্রতি বিদ্যুৎ-আহ্বান জানায়।

ইয়াসিন, মুরাদ, গঞ্জালেস প্রমুখ খোকার বন্ধুরা দায়বদ্ধতা আর দেশপ্রেমের অনির্বাণ আগুনে জ্বলে ওঠে, আত্মপরতা কিংবা আত্মমগ্নতার দেয়াল ভেঙে ছুটে যায় যুদ্ধের মাঠে। কিন্তু খোকা বাঁধা পড়ে থাকে তার আত্ম-পরিবেষ্টনীর মধ্যে। খোকার আত্মমগ্নতার কার্যকারণ উপন্যাসে খুঁজে পাওয়া যাবে রাজীব ভাইয়ের স্ত্রী নীলাভাবীর প্রতি তার দুর্মর আকর্ষণ ও লিপ্সার বাস্তবতায়। এখানেই খোকা সবাইকে ছাপিয়ে ব্যতিক্রম, ব্যতিক্রমভাবেই সে সত্য ও স্বাভাবিক। জীবনের বাস্তবতায় মনস্তত্ত্বের প্রভাবকেও যে কখনও-কখনও এড়ানো দুঃসাধ্য হয় সেটা জানান দেয় খোকার চরিত্র।

খোকা ও তার ব্যক্তিত্বের আভা গোটা উপন্যাসে একটা বৃহৎ পটভূমি। আবার দেশ-কাল-সমষ্টি উপন্যাসের আরেকটি বড়ো অংশ। এই দুই প্রেক্ষিতকে একটা জায়গায় এনে দাঁড় করিয়ে দেয় মুক্তিযুদ্ধের মতো সর্বস্পর্শী ঘটনা। মুক্তিযুদ্ধ চারপাশের সবার মনন ও জীবনে নানামাত্রিক পরিবর্তন আনয়ন করলেও, খোকার নিস্পৃহতাই যেন তাকে পরিবর্তন থেকে অস্পৃশ্য করে রাখে। অবশ্য, খোকার নিজের দিক থেকে সে যুক্তিহীন নয়। মুক্তিযুদ্ধের ধরন, প্রকৃতি, ফল এইসব নিয়ে তার ভাবনা ও সক্রিয়তাকে বিশ্লেষণ করলে তার অবস্থানটি স্পষ্ট হয়। একই সঙ্গে তার বয়সের প্রভাবক ভূমিকাটিও তার বিযুক্ততার হেতু। বয়সের বিশেষত্বের কারণে নীলাভাবীর সংলগ্নতা ছিন্ন করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। তার সঙ্গে যুক্ত হয় খোকার শ্রেণি অবস্থান, সমালোচকের বিচারে যেটি মধ্যবিত্ত অবস্থান–

> *জীবন আমার বোন* মধ্যবিত্তের পাণ্ডুলিপি। কোন্ মধ্যবিত্ত? উত্তরে বলা যাবে: খোকা। খোকাই কেন্দ্রীয় চরিত্র। খোকাকে ঘিরেই এক ঘটনাপ্রবাহ বর্ণিত। এক ধরনের প্রকাশভঙ্গিতে সে ঘটনাপ্রবাহ সচল, সর্বাঙ্গীণ। টেনশন, উত্তেজনা, উত্তাপ বিচিত্র বিষয় ধরে, কারণটি মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে; মধ্যবিত্ত পেতে চায়, করতে চায়, হতে চায়, হয়ে ওঠে স্ববিরোধী-স্বার্থপর-ভোগবাদী। তার আছে হতাশা-নৈরাশ্য-না পাওয়ার খেদ, উচ্চাশার কতকিছু। বিপত্তিরও কারণ সেখানেই। খোকা ছাড়াও মঞ্জু, নীলাভাবী, রাজীব, মুরাদ, ইয়াসিন। (শহীদ, ২০১১ : ৬৫)

খোকা মধ্যবিত্তশ্রেণির বৃহৎ পরিমণ্ডলের বাইরের কেউ নয়। বলা যায়, খোকা সে শ্রেণির একজন যোগ্য প্রতিনিধি, যে সবকিছুকে অর্জন করে নিজের শক্তি ও ক্ষমতার অর্থ নির্ণয় করতে সচেষ্ট। নীলাভাবী তার সেই উদ্দিষ্ট অর্জন। যুদ্ধপরিস্থিতি থেকে খোকা নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে চায়, কারণ যুদ্ধের দিকে যাওয়ার মানসিকতা তাকে তার নীলাভাবীর অর্জনের ভাবনা থেকে দূরে সরিয়ে নেবে। কিন্তু তার মনে এই বোধও সক্রিয় থাকে যে, সে দেশ-কাল-সমাজ প্রভৃতি বৃহৎ সত্তারও অংশ। তারপরও সে অন্যদের সমালোচনা করে এবং নিজের দায় অন্যের ওপর চাপিয়ে নিজের অবস্থানকে বৈধতা দিতে চায়। অবশ্য মুক্তিযুদ্ধের ধরন, প্রকৃতি ও পরিণতি বিষয়ে খোকার অবস্থান বা চিন্তা তার নিজস্ব যুক্তির বলয়ে নির্মিত। এখানেও খোকা একা নয়, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকলেই যে দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমুক্তির লক্ষ্যে কাতারবদ্ধ হয়েছিল, তা বলা যাবে না। সেখানেও ছিল খোকার মতো মানসিকতাসম্পন্ন মানুষেরা, যারা যুদ্ধের তোড়ের মধ্যে নিজেদের বিলীন করে দিলেও যুদ্ধের সমাপ্তিতে পুনরায় তারা তাদের অবস্থানে কেন্দ্রীভূত হয়। মুক্তিযুদ্ধ প্রকৃত জনযুদ্ধ কিনা সেই প্রশ্ন খোকার মনে ঘুরপাক খায়। সাহিত্য-সমালোচকের দৃষ্টিতে খোকার সেই অবস্থানটি যৌক্তিকভাবে নির্ণীত হয়–

> অনেকেই খোকা এবং নীলাভাবির সংশ্লিষ্টতার বিষয়টিকে খোকার পলায়ন-মনোবৃত্তির সঙ্গে এনে বিচার করেন এবং দেখান যে সে আসলে মধ্যবিত্ত মানুষের পলায়নপরতার একটা আদর্শপ্রতিনিধি। তাহলে কী মধ্যবিত্ত যুদ্ধে যায়নি? বরং বলা যায় যে যুদ্ধটা মধ্যবিত্ত-নিয়ন্ত্রিত ছিল বলেই তা দীর্ঘ ও প্রলম্বিত হয়নি। মধ্যবিত্ত নিয়ন্ত্রিত ছিল বলেই সেই যুদ্ধ প্রকৃত গণযুদ্ধ

> হয়নি, গণযুদ্ধ হওয়ার মধ্য দিয়ে আসল মুক্তির যুদ্ধ হয়নি। ফলে একবার ভারত ভেঙে পূর্ব পাকিস্তান হলেও তাতে গণমানুষের মুক্তি আসে না এবং পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ হলেও তখনও গণমানুষ মুক্তির স্বাদ পায় না। (মহীবুল, ২০১৪ : ১৯৮)

মধ্যবিত্তের দোলাচল, সংশয় ও সুবিধাবৃত্তির মানসিকতা নিয়েই খোকা উপন্যাসটির নায়ক। মাহমুদুল হক মুক্তিযুদ্ধের অনিবার্যতা বা সাফল্যের বিষয়টিকে প্রশ্নবিদ্ধ করেন না। তাঁর চরিত্র খোকা তার শ্রেণিগত সীমাবদ্ধতার মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে পড়লে মুক্তিযুদ্ধের মতো বৈপ্লবিক আলোড়ন তার সত্তায় কেমন প্রভাব ফেলতে পারে, সেটাই *জীবন আমার বোন* উপন্যাসে মুখ্য। খোকা একদিনেই যোদ্ধা হয়ে উঠলে সেটা হতো অস্বাভাবিক। যুদ্ধের দিকে সে এগিয়েছে কালক্রমে। যুদ্ধ সম্পর্কে সে নানা ভাবনায় উদ্দীপ্তও হয়েছে। যুদ্ধে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের তৎপরতাকে খোকা যুক্তি দিয়ে অনুভব করতে চেয়েছে। তাদের অবস্থানের সঙ্গে নিজের অবস্থানের যৌক্তিকতা সে যাচাই করে দেখেছে। কিন্তু যুদ্ধের প্রচণ্ডতার মধ্যে একাত্ম হয়ে নিজেকে যোদ্ধায় পরিণত করার মতো অবকাশ তার হয় না। কেননা, মুক্তিযুদ্ধ নয় মাস কালের মধ্যেই পরিসমাপ্ত হয়ে যায়। খোকা-চরিত্রটির নির্মিতির সঙ্গে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *চিলেকোঠার সেপাই* (১৯৮৭) উপন্যাসের ওসমান গণি চরিত্রটি মিলিয়ে দেখলে খোকার অবস্থানের ভিত্তি উপলব্ধি করা যাবে। ১৯৬৯ সালের গণ-আন্দোলনের প্রচণ্ডতায় যখন সারা দেশ প্রবলভাবে উত্থিত তখন শিক্ষিত যুবক আনোয়ার ও তার কতিপয় বন্ধু ভেবে পায় না জনজোয়ারের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কোথায়। মানুষ যখন রাস্তায়-রাস্তায় জীবনকে তুচ্ছ ভেবে ফেটে পড়ছে বিস্ফোরণের মতো তখন আনোয়ার ও তার বন্ধুরা শহরের রেস্টুরেন্টে বসে ভাবে দেশের ভবিষ্যৎ বিষয়ক ভাবনা। ওসমান গণি তার মধ্যবিত্ত শ্রেণির খোলস ভেঙে বেরোতে পারে না। আন্দোলনের প্রচণ্ডতা যখন তুঙ্গে তখন সেই পরিস্থিতির সঙ্গে তাল সামলাতে না পেরে, পরিস্থিতির চাপে নিজের স্নায়বিক দুর্বলতার শিকার হয়ে ওসমান গণি হয়ে পড়ে অপ্রকৃতিস্থ। মাহমুদুল হকের *জীবন আমার বোন* উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই ওসমান গণির মতো একজন খোকাকে। তার জীবনটাও নানা দুর্ঘটনায় আকীর্ণ। শৈশবে দুই বোনের সলিল-সমাধি তার মনে চিরকালের ক্ষতির ছাপ এঁকে যায়। মুক্তিযুদ্ধে সে হারায় বেঁচে থাকা একমাত্র বোনটিকেও। খোকার জীবন-বিযুক্ততা তার অনেক কিছু হারানো সত্তার অপর পিঠ– কোনো পিঠেই আশ্বাসের চিহ্ন থাকে না।

*জীবন আমার বোন*কে শেষ পর্যন্ত খোকা এবং মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস বলে অভিহিত করা যায়। বাংলাদেশের উপন্যাস-জগতের অনেক উপন্যাসের নাম করা যাবে যেগুলো আজও স্মরণীয় হয়ে রয়েছে উপন্যাসগুলোর কেন্দ্রীয় চরিত্রের জন্য। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র *লালসালু* মজিদের কাহিনি, শহীদুল্লা কায়সারের *সংশপ্তক* অনেকটাই জাহেদ ও রমজানের আখ্যান, শওকত ওসমানের প্রতীকী সৃষ্টি *ক্রীতদাসের হাসি* তাতারির, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *চিলেকোঠার সেপাই* ওসমান গণি ও হাড্ডি খিজিরের, সৈয়দ শামসুল হকের *খেলারাম খেলে যা* বাবর আলীর– তেমনি *জীবন আমার বোন* খোকার আখ্যান। খোকাকে কেন্দ্র করেই বিস্তার পেয়েছে অন্য সবকিছু। উপন্যাসটিতে মুক্তিযুদ্ধের ১ থেকে ২৭ মার্চ পর্যন্ত এই মাসখানেকের কাহিনির বিস্তার। সেই কাহিনিতে খোকার উপস্থিতি ছাপিয়ে যায় সবকিছুকে। এসবের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির বীরত্ব ও ত্যাগের ঘটনাও স্থান পায়। উপন্যাসের শেষ দিকে আসে খোকার তৃতীয় বোন রঞ্জুর মৃত্যুসংবাদ। এখানে লক্ষণীয়, খোকাকে কেন্দ্র করে কাহিনির যে-বিস্তার সেখানে খোকা ও তার বন্ধুদের সূত্রে সমকালীন রাজনৈতিক অবস্থার বিভিন্নতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। ঔপন্যাসিক খোকার

একমুখী জীবনবাদকেই সর্বস্ব করে তোলেন না, অন্যতর উপলব্ধির জন্যও রাখেন উপযোগী জায়গা। দেশের পরিস্থিতি ও ভবিতব্য বিষয়ে খোকা এবং তার বন্ধু মুরাদের তর্কবিতর্ক পারস্পরিক বিভিন্নতার রাজনীতি শুধু নয়, বিভিন্ন মতাদর্শের রাজনৈতিক শ্রেণিরও বর্তমানতাকে বোঝায়। খোকা যে রাজনীতি বোঝে না তা নয়, কখনো-কখনো তাকে খুবই যুক্তিশীল বলে মনে হয়– নীলাভাবীর স্বামী রাজীব ভাইকে সে বলে– 'যারা এখানে পাহাড়প্রমাণ পুঁজি খাটিয়েছে, কিংবা যারা নিয়ন্ত্রিত পন্থায় বাজার হিশেবে পেতে চায় দেশটাকে, তাদের ভূমিকার কথা আপনাকে ভাবতে হবে। দেশের লোকটোক সব ফালতু কথা, তাদের কাঁউমাউ চিল্লাচিল্লিতে সত্যিই কিছু যায় আসে না, ...' (মাহমুদুল, ২০০৫ : ১২৮)।

খোকাকে যতই নৈরাজ্যবাদী আর অবিশ্বাসী শোনাক না কেন তার যুক্তিকে সম্পূর্ণরূপে নস্যাৎ করে দেওয়াও সম্ভবপর নয়। খোকার যুক্তি– 'অর্থনৈতিক মুক্তিটুক্তি ওসব হাফসোল দেওয়া কথা, বার্নিশ করা কথা, যে যার স্বার্থের কথা ভেবে পাগলা হয়ে উঠছে, সবাই ভাবছে যার যার নিজের হাতে চাঁদ পাবে।' (মাহমুদুল, ২০০৫ : ১২৮) মুক্তিযুদ্ধের পর থেকে ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাসের ধারা মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ করে দেখলে বরং খোকার এমন উক্তিকে অন্তর্যামীসুলভ পর্যবেক্ষণ বলে মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক। বস্তুত খোকার মনোজাগতিক স্বরূপ এমনই জটিল ও বহুমুখী যে সহজ-সরল ও একরৈখিক দৃষ্টিক্ষেপে সেই জটিলতার হদিস নেওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়। এরকম চরিত্র বাস্তবে কী পরিমাণে থাকে সে-প্রশ্ন করা অবান্তর, কেননা খোকার চারিত্রিক বাস্তবতাকে ঔপন্যাসিক মাহমুদুল হক বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পুরোপুরি সক্ষম হয়েছেন।

খোকার যা-কিছু অর্জন ও উপলব্ধি সবই তার জীবন থেকে পাওয়া। তার জীবন-বিযুক্ততা তারই নিজস্ব পারিবারিক পরিপ্রেক্ষিতের ফল। *অনুর পাঠশালা* উপন্যাসের অনুর মতো খোকাও শৈশব থেকে বিচ্ছিন্নতার পাঠ নিতে-নিতেই বড়ো হয়। তার প্রবাসী পিতার বিত্তের অভাব নেই। শৈশবে দুই বোনকে হারানো খোকা আর রঞ্জু বেড়ে ওঠে আরেক জগতে– ধানমন্ডির অভিজাত এলাকায়। স্বাভাবিকভাবেই নীলাভাবী, বেলী, লুলু চৌধুরী এসব নারীর প্রতি খোকার আকর্ষণ ও সংযোগ তার নিঃসঙ্গতার প্রতিষেধক রূপে দেখা দেয়। খোকা তাদের প্রতি প্রবল আকর্ষণবোধ করলেও তার মধ্যে থাকে এক ধরনের জীবন-স্নিগ্ধতা। নারীর সৌন্দর্যকে সে প্রকৃত সুন্দরের দৃষ্টিতেই পরখ করে। বন্ধু মুরাদের বোন লুলু চৌধুরীর ওপরে ওঠার অসৎ পন্থাকে সে ঘৃণা করে। খোকা কখনো-কখনো নিজেকেও অভিযুক্ত করে নিজের লাগামহীন জীবনদৃষ্টির জন্য। সব মিলিয়ে খোকা জীবনের নানা অনুভবের মধ্যে ঘুরপাক খেতে-খেতে বেড়ে ওঠা এক চঞ্চল সত্তা। খোকা চরিত্রটির পূর্ণতার অনুভূতিকে একজন সমালোচক অত্যন্ত সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন–

> খোকা লেখকেরই মানসসন্তান। খোকার নিঃসঙ্গ বেদনাহত শূন্যতাবোধের সঙ্গে লেখকও একাত্ম। কেননা সাতচল্লিশের রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে তিনি উন্মূলিত হয়েছেন জন্মভূমি থেকে, চিরতরে হারিয়েছেন শৈশবের আনন্দময় খেলাঘরকে। জন্মভূমি নিয়ে, শৈশব নিয়ে এই স্মৃতিকাতরতা থেকে তিনি মুক্ত হন নি আমৃত্যু। *কালো বরফ* উপন্যাসে আছে এই রক্তক্ষরণের মর্মন্তুদ জীবনচিত্র। খোকা এক দুর্যোগে অঞ্জু-মঞ্জুকে হারিয়ে আকড়ে ধরেছিল রঞ্জুকে; আরেক দুর্যোগে সেই রঞ্জুকেও হারিয়ে এখন সে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ। দেশরূপ পুকুরে তাকে বিসর্জন দিতে হয়েছে শৈশবরূপ বোনরূপ জীবনময়তাকে। যে শৈশবের প্রতি, যে বোনের প্রতি, যে জীবনের প্রতি তার বিশুদ্ধ নির্মল মমতা ও ভালোবাসা তা এখন দেশরূপ পুকুরে নিমজ্জমান। সুতরাং তার দেশাত্মবোধের সঙ্গে এই পবিত্র ভালোবাসার এক নিবিড় সম্পর্ক। (আজিজুল, ২০১৪ : ২১১)

ব্যক্তিসত্তা ও সমাজসত্তার পারস্পরিক সম্পর্কসূত্রের মধ্য দিয়ে বিকশিত হওয়া খোকা ও তার বহির্জাগতিক অবস্থান উপন্যাসের সমাপ্তিতে এসে একটা যৌক্তিক পরিণতিতে পৌঁছায়। খোকা চরিত্রটি বাংলাদেশের উপন্যাস-জগতে একটি শক্তিশালী সৃজনশীল শিল্পরূপের স্বীকৃতি লাভ করে সংগত কারণেই।

মাহমুদুল হকের মুক্তিযুদ্ধ-ধারার দ্বিতীয় উপন্যাস *খেলাঘর*। ১৯৭৮ সালে রচিত উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় রচনাকালের দশ বছর পরে, ১৯৮৮-তে। মুক্তিযুদ্ধের সাত বছর পরে লেখা উপন্যাসটিকে রচয়িতার স্মৃতি-অভিজ্ঞতার অভিজ্ঞান বলে অভিহিত করা যায়। আবার উপন্যাসটিকে বাংলাদেশের একটি বিশেষ সময়ের ঐতিহাসিক মাত্রার পুনর্দর্শনও বলা যায়। মুক্তিযুদ্ধ যেহেতু একটি ঐতিহাসিক ঘটনা, সেহেতু মুক্তিযুদ্ধাশ্রিত উপন্যাসকে বলা যায় এক ধরনের ইতিহাস-পুনর্দর্শন। মাহমুদুল হকের মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক পূর্ববর্তী উপন্যাসটি রচিত হয় মুক্তিযুদ্ধ শেষের প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই। ১৯৭৮ সালে তাঁকে পুনরায় একই বিষয় নিয়ে উপন্যাস রচনায় ব্যাপৃত হতে দেখা যায়। বস্তুত ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর বাংলাদেশের রাজনীতিতে গণতন্ত্রের পরিবর্তে একনায়কত্ব ও সামরিক স্বৈরাচারের অনুপ্রবেশ এবং সুদীর্ঘকাল সেই ধারাতেই আবর্তিত হতে থাকে রাজনীতি।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস থেকে দেখা যায় বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের কয়েক বছরের মধ্যেই দেশে ধর্মীয় ও মৌলবাদী আদর্শের রাজনীতি প্রবেশ করছে একনায়ক এবং সামরিক স্বৈরাচারের পৃষ্ঠপোষকতায়। ফলে, গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ ক্রমে পিছু হটতে থাকে। সামাজিক-সাংস্কৃতিকভাবে ধর্মনির্ভর রাজনীতি দেশপ্রেমী চেতনার বিপরীত মেরুতে অবস্থান নিয়ে বিকশিত হতে থাকে নানাভাবে। এমন পরিস্থিতিতে ঔপন্যাসিক মাহমুদুল হকের মুক্তিযুদ্ধাশ্রিত উপন্যাস রচনায় মনোনিবেশের ঘটনাটি নিঃসন্দেহে কৌতূহলোদ্দীপক।

জীবন আমার বোন উপন্যাসে যুদ্ধকালীন অবস্থার বিবরণ তত গুরুত্ব পায়নি, কিন্তু *খেলাঘর* সম্পূর্ণটাই যুদ্ধ-পরিস্থিতির চিত্রণ। প্রথমটিতে মূল চরিত্র ছিল খোকা, বর্তমান উপন্যাসে মূল চরিত্র ঝুমি বা আন্না বা লতা বা রেহানা– একজন যুবতী যার অনেকগুলো নাম। রেহানা শত্রুপক্ষের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার পরে গণধর্ষণের শিকার হয়। ঘটনার সেখানে শেষ নয়– শুরু। ধর্ষিতা রেহানার সত্তার মধ্যে চলতে থাকে তার নিজস্ব জীবন ও জগত নিয়ে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। পাশাপাশি সমান্তরাল আরেকটি রেখায় এগিয়ে চলে মুক্তিযুদ্ধের সক্রিয়তা– আক্রমণ, পাল্টা আক্রমণ ও প্রতিরোধ। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ-এর ভয়াল রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী রাজধানী শহর ঢাকায় নিরীহ মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হিংস্রতার চরম প্রকৃতি প্রদর্শন করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলের ছাত্রী রেহানাসহ আরও অনেকেই আক্রান্ত হয় শত্রুসৈন্যের হাতে। অনেকেই প্রাণ হারায় কিন্তু রেহানা প্রাণে বেঁচে যায়। তাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় উদ্ধার করা হয় সদর রাস্তা থেকে। তারই চাচাতো ভাই টুনু তাকে গ্রামে পাঠিয়ে দেয় বন্ধু ইয়াকুবের জিম্মায়। গ্রামের নিভৃত আশ্রয়ে কলেজশিক্ষক ইয়াকুব এবং রেহানার জীবন কাটতে থাকে যুদ্ধের সমান্তরালে। রেহানার ধর্ষিতা হওয়ার ঘটনা তখনও ইয়াকুবের নিকটে অজানা।

রেহানা, নিভৃত গ্রাম মিঠুসার, যুদ্ধদীর্ণ ও প্রতিরোধকারী বাংলাদেশ– এই প্রেক্ষিত নিয়ে এগোতে থাকে সমকালীন জীবন এবং *খেলাঘর* উপন্যাস। রেহানার নেপথ্যে থাকে তার ধর্ষিতা হওয়ার ইতিহাস আর বাংলাদেশের নেপথ্যে থাকে তার লুণ্ঠিত-নির্যাতিত হওয়ার ইতিহাস। রেহানার সত্তার অভ্যন্তরে চলে তার নিজস্ব সংগ্রাম এবং বাংলাদশের অভ্যন্তরে চলতে থাকে

আরেক সংগ্রাম যেখানে সম্মিলিত অসংখ্য নর-নারী। উপন্যাস এগোয় দুটি রেখা ধরে– একটিতে রেহানা এবং ইয়াকুবের জনান্তিকের জীবন এবং অন্যটিতে যুদ্ধরত বাংলাদেশের উত্তাল তৎপরতা। যুদ্ধরত বাংলাদেশের সবটাই বর্তমান বা ভয়ংকর বর্তমান। রেহানার বর্তমান এক ধরনের আচ্ছন্নতা বা ঘোরলাগা বাস্তবে বৃত। ঔপন্যাসিক পাঠকের সামনে যে-রেহানাকে প্রথম উপস্থাপন করেন তার ইতিহাস পাঠকের অজানা থাকে এবং রেহানার ভেতরে ঘটে যাওয়া ভয়াল বাস্তবতার পরিণতিকে সামলাতে রেহানার সত্তার গভীরে কী আলোড়ন চলে তা-ও পাঠকের পক্ষে জানা সম্ভব হয় না। রেহানার স্নায়ুতন্ত্র তার নিজের সত্তাকে যে তার নিজের মতো করে রক্ষা করতে চায়, সেটা তার কথা থেকে স্পষ্ট। মিঠুসার গ্রামে সে যখন একটা বিধ্বস্ত জীবন নিয়ে ইয়াকুবের জিম্মায় আসে কেবলই বেঁচে থাকবার জন্য, অন্য কোনো কারণে নয়, তখন তার একটা বড়ো অবলম্বন হয়ে দেখা দেয় তার শৈশব-কৈশোরের জীবন, তার সমকালীন জীবন নয়। দাদাভাই, দিদামণি, বকুলবালা, পাতা, বাবু এসব চরিত্র আর ঘটনা ধারাবাহিক ও পারম্পর্যহীনভাবে উত্থাপিত হতে থাকে রেহানার সংলাপে। তার সমগ্র অতীত দিয়ে সে সংযুক্ত হয় বর্তমানের ইয়াকুবের সঙ্গে। গল্প বলার ভঙ্গিতে রেহানা ফিরে যায় তার শৈশবে এবং তার গল্প বলার ধরনটাও তার চরিত্রকে বদলে দেয়– রেহানাকে মনে হয় বর্তমান নয়, অতীত থেকে আসা এক চরিত্র, তার গল্পই তাকে এমন একটা অবস্থানে দাঁড় করায়–

> একটা ছইওলা টাবুরে নৌকোর ভেতর সেই লাল শাড়ি পরা বৌটি ঢুকে গেল। আস্তে আস্তে চলতে শুরু করে নৌকোটা। কাছাকাছি কোথাও ঝপ্ করে একটা শব্দ হয়। বাবু বললে, পাড় ভেঙে পড়লো। ঠিক তক্ষুণি হুপ হু-উউউউউ-প করে একটা বাঁশি বেজে উঠলো। বাবু হাততালি দিয়ে বললে, ইস্টিমার আসছে ইস্টিমার! দেখি ঝুপঝুপ ঝুপঝুপ করে সত্যি সত্যিই একটা ইস্টিমার ঘাটের দিকে আসছে। কি জানি কেন, আমার বুকের ভেতর তখন গুবগুব শুরু হয়ে গেছে, এমন খারাপ হয়ে গেল মন, কি বলবো! পাতা বললে, আয় ভাই, আমরা তিনজনে মিলে নদীটাকে মারি। কোঁচড়ের ঢিলগুলো ভাগাভাগির পর পাতা পানিতে একটার পর একটা ঢিল ছোঁড়ে আর বলে, এই নদী, বজ্জাত রূপসা, বৌটাকে ভালোমতো ওপারে পৌঁছে দিবি, যদি না দিস, রোজ এসে তোকে এইভাবে ঠেঙিয়ে যাবো। (মাহমুদুল, ২০০৪ : ৪৬)

না ইয়াকুব, না পাঠক কারও পক্ষেই বোঝা সম্ভব হয় না রেহানার সংলাপ তার সচেতন কথনপ্রক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ, না তা কোনো অসংলগ্নতার ফল, যে অসংলগ্নতার জন্যে সে দায়ী নয়, দায়ী সেসব আগ্রাসী লোক যাদের হায়েনা বা হিংস্র কোনো পশুর সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে। রেহানার যে ঘরের স্বপ্ন ছিল সেটা একটা চিরকালীন সত্য, কেননা, সব নারীরই একটা নিজস্ব একান্ত ঘরের স্বপ্ন থাকে। তার সেই স্বপ্ন ধূলিসাৎ করে দিয়েছে পাকিস্তানি বর্বরেরা। রেহানার মতো অজস্র রমণীর স্বপ্ন ধূলোয় মিশে গেছে। সে-সব স্বপ্নের বিনিময়ে যদি দেশ স্বাধীন হয় তাহলেই রেহানা ও তার মতো মানুষদের ত্যাগের একটা অর্থ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই উপন্যাসে, রেহানা যত বিমর্ষতার দিকে নিয়ে যায় মুকুল তত উদ্ধারের উপায় বয়ে আনে। *খেলাঘর* উপন্যাসের এই দুটি রেখার গন্তব্য অভিন্ন– একটি বিশাল সমষ্টির জীবনকে অযুত পতনের হাত থেকে চিরদিনের জন্য রক্ষা করা।

মাহমুদুল হক তাঁর *খেলাঘর* উপন্যাসে যে-রেহানার বেদনাকে এঁকেছেন তা শত-শত বেদনাঘন কাহিনির এক অতি ক্ষুদ্রাংশ। কিন্তু একটি জীবনের বেদনার মধ্যে অজস্র জীবনের বেদনাকে অমর করে রাখতে চেয়েছেন তিনি। গোলাপের বাগানে থেকে অসংখ্য গোলাপের ভিড়ে একটি গোলাপকে কাছ থেকে গভীর দৃষ্টি দিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে চান ঔপন্যাসিক। তা এজন্য যে, শত-শত বেদনার গল্পকে স্বল্প পরিসরে রূপ দেওয়াটা অত্যন্ত দুরূহ। উপন্যাসের পরিসমাপ্তিতে

এসে রেহানাও হারিয়ে যায়, নেপথ্যে চলে যায়। উপন্যাস থেকে রেহানার চিরবিদায়ের মুহূর্তটিতেই জানা যায়, রেহানার জীবন একটা ভয়ংকর পরিণতির শিকার হয়েছিল। রেহানার চাচাতো ভাই টুনু এসে রেহানাকে মিঠুসার গ্রাম থেকে নিয়ে যায় ঢাকায়। রেহানার জীবনের সত্য-উন্মোচনের মধ্যে উপন্যাসও সমাপ্ত। রেহানাকে এর অধিক মহীয়ান করতে চাননি লেখক। তাকে তিনি করতে চেয়েছেন অসংখ্যের প্রতিনিধি। রেহানার শোকের পটভূমি পরমুহূর্তেই শক্তির অনুভবের দিকে ধাবিত হয়। ফলে, তার বিদায়ের সঙ্গে-সঙ্গে আবির্ভাব ঘটে সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের যাদের 'ম্যাজিক'-এর ফল বাংলাদেশ। শোক এবং শক্তির এই সমান্তরাল কাহিনি একটি জনপদের চিরগৌরবের কাহিনি– *খেলাঘর* অজস্র ঘরের ভেঙে যাওয়ার পরে একটি ঘরের গড়ে ওঠার শব্দশিল্প। যে-ঘর গড়ে তোলার ইঙ্গিত নিয়ে উপন্যাসের শেষে উপস্থিত হয় ম্যাজিক মুকুল। সমালোচকের পর্যালোচনা– 'এই উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের পতাকাবাহী হলো মুকুল। মূলত তার সংলাপ, তার ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে *খেলাঘর* উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে।' (হরিশংকর, ২০১২ : ৪৭) আদিনাথের ভিটে হতে রেহানার অন্তর্ধান এবং মুকুলের আবির্ভাবে 'খেলাঘর' নামটি যেন পূর্ণতা পায়। স্বাধীনতার জন্য রেহানার এই খেলাঘরও ভেঙে তছনছ হয়। রেহানা তার অতীত ভুলে, যুদ্ধের ভয়াবহ অভিজ্ঞতাকে পাশ কাটিয়ে ইয়াকুবের সাথে খেলাঘরে খেলায় মেতে ছিল আদিনাথের ভিটায়। কিন্তু বাস্তবে শিশুদের খেলাঘরে যেমন খেলা হয় একেকবার একেক রকমের খেলা, ঠিক তেমনই আদিনাথের ভিটেতেও রেহানার ঘরকন্নার খেলাঘর ভেঙে উপস্থিত হয় মুকুল– যুদ্ধের খেলাঘর পাতাতে। মুক্তিযুদ্ধের পতাকাবাহী খেলাঘরের প্রতীক হয়ে মুকুলের আগমনও যেন খেলাঘর নামটিকে সার্থক করে তোলে।

মাহমুদুল হকের মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক তৃতীয় উপন্যাস *অশরীরী* (২০০৪)। এটির রচনাকাল ১৯৭৯ সাল। রচনাকালের পরিপ্রেক্ষিতটি তাঁর পূর্ববর্তী *খেলাঘর* উপন্যাসের মতো এখানেও স্মরণযোগ্য। মাত্র দুই বছরের ব্যবধানে পর-পর তাঁর দুটি উপন্যাস রচনা– দুটিরই বিষয়বস্তু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। ১৯৭৫ সালের ভয়ংকর অধ্যায়ের পরিব্যাপ্ত ছায়ায় তাঁর এই উপন্যাস-রচনার উদ্যোগ মাহমুদুল হকের সাহসের পরিচায়ক। ১৯৭৫ থেকে ১৯৮০ সাল– এই পাঁচ বছর স্বাধীন বাংলাদেশের কলঙ্কজনক ইতিহাসের ভূমিকাংশ। কাজেই একটা ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে ছিল দেশ-জাতি-সমাজ-ব্যক্তি সবকিছুই। মুক্তিযুদ্ধের তৎকালীন অপ্রিয়মাণতার মধ্যে মাহমুদুল হক ফিরিয়ে এনেছেন মুক্তিযুদ্ধকেই। তাঁর এ প্রচেষ্টা কেবল ব্যক্তিমানসের গূঢ় অভিব্যক্তির প্রকাশ নয়, কালিক দায়বদ্ধতারও স্বাক্ষর। *খেলাঘর* উপন্যাসে আমরা পেয়েছি রেহানা নামের বাংলার এক নারীর ত্যাগের মহিমার অকথিত আখ্যান। *অশরীরী* উপন্যাসেও একইভাবে, বাঙালির বিজয়ের নেপথ্যে যে-বিপুল ও জমাটবদ্ধ বেদনার ইতিহাস আছে তারই শাব্দিক প্রকাশ ঘটেছে। মাহমুদুল হক তাঁর সৃজনশীল সত্তাকে পরাভবের হাতে সমর্পণ করেন না বলে পর-পর দুটি উপন্যাস রচনার দুরন্ত সাহস প্রদর্শন করেন। বাংলাদেশের এবং মুক্তিযুদ্ধের সাহিত্যশিল্পে এর আবেদন অস্বীকার করা যায় না।

মাহমুদুল হকের *অশরীরী* উপন্যাসের ফ্ল্যাপে মুদ্রিত মন্তব্য থেকে খানিকটা উদ্ধৃতি লক্ষ করা যাক–

> '*অশরীরী* সেই ধারার এক স্মরণীয় সংযোজন, পাকবাহিনীর ক্যাম্পে আটক আম্বিয়ার দেহ দলিত-মথিত হয়ে যায় নির্মম অত্যাচারে, পীড়নের সেই অন্ধকারের মধ্যে তাঁকে গ্রাস করে স্মৃতি, বোধগুলো হারাতে হারাতে একসময় আম্বিয়া যেন হারাতে বসে তাঁর সত্তা, তাঁর শরীর,

> আর সেই অন্ধকারে সমস্ত কিছু ছাপিয়ে জেগে ওঠে ভিন্নতর এক উপলব্ধি, এক আচ্ছন্নতা, যা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় মানুষের ভেতরের মানুষটিকে, আত্মার ভেতরের আত্মা, সত্তার ভেতরের সত্তাকে। *অশরীরী* তাই উপরকার কাহিনী কাঠামোর গভীরে ভিন্নতর মানবসত্যের প্রতি ইশারা করে এবং সেখানেই তার অনন্যতা।' (মাহমুদুল হক, ২০১০ : ফ্ল্যাপ পাঠ)

জীবন আমার বোন উপন্যাসের কাহিনি মূলত ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের ২৫ তারিখের পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। *অশরীরী* উপন্যাসের কাহিনির প্রারম্ভ যুদ্ধের তুঙ্গতম অধ্যায় অর্থাৎ ভয়ংকর যুদ্ধপ্রবাহের দিনের ঘটনা দিয়ে। উপন্যাসটির সূচনায় একটি ক্যাম্পের অবরুদ্ধতার চিত্র, যেখানে মানুষের অস্তিত্বের সংকোচন ঘটে, যেখানে সত্তা গ্রাসিত হয় এবং যেখানে মানুষকে পলে-পলে অপেক্ষা করতে হয় মৃত্যু নামক পরিণতির জন্য। পৃথিবীর যুদ্ধবিষয়ক বহু উপন্যাসে এরকম ক্যাম্প বা কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের চিত্র বর্ণিত হয়েছে যেখানে ব্যক্তি মানুষের ভেতরকার সংগ্রামের সক্রিয়তাকে খুব কাছে থেকে লক্ষ করা যায়। *জীবন আমার বোন* উপন্যাসের নায়ক খোকা যুদ্ধে যায়নি কিন্তু যুদ্ধের ভয়াবহতার সে সাক্ষী। *খেলাঘর* উপন্যাসের রেহানাও যুদ্ধ-গ্রাসের শিকার। কিন্তু *অশরীরী* উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র আম্বিয়া এদের সকলের চাইতে আলাদা। সে মূর্ত বর্তমান– তার সত্তা ও শারীরিকতা সবটাই যুদ্ধের সর্বনাশের লক্ষ্যবিন্দু। আম্বিয়া বর্তমান লেখকের স্মৃতির অবলম্বনের সূত্রে নির্মিত। মুক্তিযুদ্ধের আট বছর পরে ঔপন্যাসিক মাহমুদুল হকের অবলম্বন যুদ্ধের প্রত্যক্ষতা। হারিয়ে ফেলার আবর্ত থেকে অতীতকে তুলে এনে বর্তমানের স্রোতের সঙ্গে জুড়ে দেন তিনি। সেই অতীত-প্রতিকূলতার সঙ্গে সত্তার টিকে থাকা একদিকে প্রচণ্ড সক্রিয়তার, অন্যদিকে মরণযজ্ঞের রক্তাক্ত ক্ষরণের। আম্বিয়া একজন ব্যক্তি হয়ে সমস্ত সময়টাকে ধারণ করে। বিশাল সমাধিলিপির শিয়রে উৎকীর্ণ একটি গাথার মতো আম্বিয়ার মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক ফুটিয়ে তোলেন এক অবিনশ্বর কালগ্রন্থিকে। এই উপন্যাসের চরিত্র ও কাল সম্পর্কে সমালোচকের উক্তি, '*অশরীরী* সেই ধরনের উপন্যাস যেখানে অণুবীক্ষণের তলায় এসেছে এমন সব মানুষ, নিপাট সাধারণ মানুষ যারা তথাকথিত নায়ক নয়, ভয়-ভীতি, শোক দুঃখ সব মিলিয়ে রক্তমাংসের উপস্থিতি যারা। একটা ঐতিহাসিক পালাবদলের সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তাদের জীবন, আর তার সামনে পড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে স্বাভাবিক বেঁচে থাকাগুলো'(শুভদীপ, ২০১৪ : ২৮৬)।

অশরীরী মাহমুদুল হকের মুক্তিযুদ্ধের ধারার উপন্যাসের মধ্যে স্বতন্ত্র। অন্য দুটি উপন্যাসেও মুক্তিযুদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কিন্তু *অশরীরী* উপন্যাসেই আমরা প্রথম দেখতে পাই বাঙালি এবং পাকিস্তানির পাস্পরিক অবস্থান। পাকিস্তানি তার সমস্ত প্রচেষ্টাকে একীভূত করেছে বাঙালিকে নিধন করবার কাজে এবং বাঙালি তার সমস্ত প্রচেষ্টাকে জড়ো করেছে সেই হীন-আয়োজন থেকে নিজেকে বাঁচাতে। বাঙালি জাতির প্রতি পাকিস্তানিদের ঘৃণ্য আচরণ ক্যাম্পের ঘন অন্ধকার জগত থেকে বেরিয়ে পড়ে এবং ছুটে যায় সেই উচ্চারণ 'জয়বাংলা'র মন্ত্রধারী ঐক্যবদ্ধ মানুষের দিকে– 'আব্‌ভি শিখলাও সবকো, জাহির করো, ঔর গান্‌ড মারতে রহো সব বাঙ্গালি চিড়িয়াকো, লাল কর দো।' (মাহমুদুল, ২০১০ : ৭) আম্বিয়া এক সাধারণ মানুষ কিন্তু সে অসাধারণ হয়ে উঠেছে নিজের সত্তাকে লড়াইয়ের মধ্যে লিপ্ত করে। যুদ্ধের পূর্বে আম্বিয়া ছিল একজন সাংবাদিক। দেশপ্রেম বা দেশের প্রতি দায়বোধ এসব বিষয় নিয়ে গভীরভাবে ভাববার মতো অবকাশও তার ছিল না। বরং সংসারজীবনে সে খানিক বিপত্তির মধ্যেই ছিল। স্ত্রীর সঙ্গে দাম্পত্য অ-সুখের ফল হিসেবে তার স্ত্রী তাহেরা তাকে ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু পাঠক হিসেবে আমরা জানতে পারি, আম্বিয়া-তাহেরার দাম্পত্য অ-সুখের পরিস্থিতিতে আম্বিয়া সম্পূর্ণ দোষী

নয়। সাংবাদিকতার পাশাপাশি সে তাহেরাকে পড়াত। কিন্তু তাহেরা গর্ভবতী হয়ে পড়ে অন্য একজনের দ্বারা। সেই কর্মের মিথ্যে দায় মাথায় নিয়ে আম্বিয়া তাহেরাকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়। এদিকে আম্বিয়ার ফুপাতো বোন মনোয়ারা তাদের বাড়ি এলে তাহেরা তাকে আম্বিয়ার সঙ্গে জড়িয়ে সন্দেহ করতে শুরু করে। আম্বিয়া পতিত হয় হয় গভীর বিষাদে। আম্বিয়ার পেশাগত জীবনও হুমকির মুখে পড়ে। দেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। পাকিস্তানি হানাদারদের আক্রমণে অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হয় আম্বিয়ার কাগজের কর্মস্থল। স্ত্রী-ও তাকে ছেড়ে চলে যায়। এই অপ্রসন্ন ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে আম্বিয়া উপস্থিত হয় মুক্তির যুদ্ধে। যার সঙ্গে যুদ্ধের কোনো সম্পর্ক ছিল না সেই আম্বিয়া কেবলমাত্র বাঙালি হওয়ার অপরাধে পাকিস্তানি হানাদারবাহিনীর কবলে পড়ে। অন্তরে এক সর্বগ্রাসী শূন্যতা নিয়ে আম্বিয়া দেশ-সমাজ-অঙ্গীকার এইসব বিপুল দায়ভারের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। পাকিস্তানি ক্যাম্পে আম্বিয়ার ওপর চলে অমানুষিক নির্যাতন। এতকাল সে ছিল কেবল মানসিক পীড়নের কবলে, এর সঙ্গে যুক্ত হয় শারীরিক নির্যাতন। কিন্তু আম্বিয়ার প্রাণপণ চেষ্টা, প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে অস্ত্রহীন এক লড়াই চালিয়ে জয়ী হওয়া। শূন্যতার অবস্থান থেকে আম্বিয়া পৌঁছায় অর্থপূর্ণ অবস্থানে। অস্তিত্বহীনতার বিন্দু থেকে আম্বিয়ার চরিত্র পৌঁছায় অস্তিত্ববানতার সার্থকতায়। ১৯৭১ সালে বাঙ্গালির মুক্তির সংগ্রামে আম্বিয়ার মতো নাম-গোত্রহীন মানুষেরাই ছিল লড়াইয়ের সৈনিক। তাদের ত্যাগ-বিসর্জনের ফলেই বাঙালি জাতির স্বদেশভূমি অর্জন সম্ভব হয়েছিল।

অশরীরী উপন্যাসটিকে ফরাসি অস্তিত্ববাদী দার্শনিক-ঔপন্যাসিক জঁ পল সার্ত্র-এর অস্তিত্ববাদী নাটক *মেন উইদাউট স্যাডোজ* (১৯৬০)-এর সঙ্গে তুলনা করলে মাহমুদুল হকের সাহিত্য-ভাবনায় অস্তিত্ববাদী জীবনদৃষ্টির উপস্থিতি উপলব্ধি করা যায়। সার্ত্র-এর নাটকটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে লেখা। ১৯৪৪ সালে হিটলারের গেস্টাপো বাহিনী ফ্রান্সের একাংশ দখল করে রেখে দেয় নিজেদের অধিকারে। সেখানে তারা ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করে। মুক্তিকামী ফরাসি মানুষকে ধরে-বেঁধে এনে নির্যাতন করা ছিল জার্মান সৈন্যদের নৈমিত্তিক কাজ। ক্যাম্পে নির্যাতিত হলেও পরাভব মেনে নেয়নি এমন কয়েকটি চরিত্রের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত হয়েছিল নাটকের আখ্যানবস্তু। সেখানে দেখা যায়, সাধারণ কয়েকজন মানুষ অস্তিত্বের লড়াইয়ে জয়ী হয় এবং ফ্রান্স স্বাধীন হলে তাদের সেই লড়াই আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। নাটকটির ইংরেজি অনুবাদে আরেকটি শিরোনাম ব্যবহৃত হয়– *ডেথ উইদাউট বিইং বারিড* অর্থাৎ যেসব মৃত্যুকে সমাধিস্থ করা যায় না। *মেন উইদাউট স্যাডোজ* নাটকটি আবদার রশীদের অনুবাদে প্রকাশিত হয়েছিল *ছায়াহীন কায়া* শিরোনামে। মাহমুদুল হকের *অশরীরী* শিরোনামটি সার্ত্র-এর উল্লেখকৃত নাটকটির শিরোনামকে স্মরণ করিয়ে দেয়। বিষয়বস্তু ও ভাবনার দিক দিয়েও মাহমুদুল হক সার্ত্র-এর অনুগামী। সার্ত্র-এর নাটকটিতে আমরা দেখি, বন্দি ফরাসি যুবকেরা মুক্ত ফ্রান্সে থাকাকালে কখনও ভাবেনি, দেশের প্রতি কর্তব্য কী বা নিজের অস্তিত্ব দেশের ও জাতির প্রয়োজনের সঙ্গে কীভাবে সংযুক্ত হয়ে যায়, সে-সম্পর্কেও তাদের ধারণা স্পষ্ট ছিল না। কিন্তু বন্দি অবস্থায় ক্রমে তারা তাদের অস্তিত্বের সার্থকতা অনুভব করে এবং কর্তব্য-দায়বোধ এসব বিষয়ে তারা হয়ে ওঠে সচেতন। এর ফলে শত নির্যাতন সত্ত্বেও তারা সত্য প্রকাশ করে না। নির্যাতনের শিকার হয়ে তারা মৃত্যুবরণ করলেও অস্তিত্বের লড়াইয়ে তারা জয়ী হয়।

১৯৪৩ সালে প্রকাশিত হয় জঁ পল সার্ত্র-এর অস্তিত্ববাদী দর্শনের আকর-গ্রন্থ *সত্তা ও শূন্যতা*। ১৯৪৪-এ প্রকাশ পায় তাঁর বিখ্যাত অস্তিত্ববাদী উপন্যাস *লা নজে*। ১৯৪৬ সালে সার্ত্র-এর

আরেকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় *অস্তিত্ববাদ এবং মানবতাবাদ* শিরোনামে। ফরাসি দার্শনিক সার্ত্র অস্তিত্ববাদী দর্শনকে সাহিত্যে প্রয়োগ করে বিশ্বের সাহিত্য-ভাবনার ক্ষেত্রে রাখেন স্মরণীয় অবদান। মানুষের সত্তার গভীরে থাকা চেতনা তাকে জীবনের বিবিধ প্রতিকূলতায়, লড়াইয়ে অনুপ্রেরণা যোগায়। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নিজের সত্তাকে পরীক্ষার মুখোমুখি করে ব্যক্তি জয়ী হয়। সার্ত্র তাঁর উপন্যাসে-নাটকে দেখান যে ব্যক্তি তার স্বাধীন অবস্থা থেকেও পরাধীন অবস্থায় অনেক বেশি সচেতন হয়ে উঠতে পারে। অস্তিত্বের অর্থ তার কাছে স্বাধীন থাকা অবস্থায় যতটা স্পষ্ট, পরাধীন অবস্থায় তারও অধিক স্পষ্ট হয়। *মেন উইদাউট স্যাডোজ* নাটকে শত্রু-ক্যাম্পে বন্দি যুবকদের কেউ তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে দেয়নি, তারা নিজেরাই নিজেদের অন্তরের মধ্যে অন্বেষণ চালিয়ে অস্তিত্বের অর্থকে আবিষ্কার করেছিল। মাহমুদুল হকের *অশরীরী* উপন্যাসে শত্রু-ক্যাম্পে বন্দি আম্বিয়া তার সত্তাকে প্রাণপণে বাঁচিয়ে রাখতে চায় নির্যাতনের মধ্যেও স্থির থেকে, স্মৃতিকে অবলম্বন করে সে বর্তমানের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করে নিজের সত্তাকে। যুদ্ধপূর্বকালে জীবনের জাগতিক সমস্যা, মানসিক কষ্ট, আর্থিক অসচ্ছলতা এসব নিয়ে সে এতটাই ব্যতিব্যস্ত ছিল যে দেশ-জাতি-দায়বোধ এসব নিয়ে ভাবনার কোনো অবকাশ তার ছিল না। কিন্তু পাকিস্তানি হানাদারদের হাতে বন্দি অবস্থায় তার প্রতিমুহূর্তের চিন্তা দাঁড়ায়– দেশ এবং দেশের স্বাধীনতা। সে বাঙালি হওয়ার অপরাধে পরিণত হয় শত্রুর লক্ষ্যবস্তুতে। কাজেই তার প্রাণান্ত চেষ্টা সেই বাঙালিত্বকে রক্ষা করা। নিজেকে রক্ষা করতে না পারলে যে স্বাধীনতাও তার কাছে নিরর্থক, সেই সত্য আবিষ্কার করতে পারে আম্বিয়া। সার্ত্র-এর নাটকে আমরা দেখতে পাই, বন্দিদের মানসিকভাবে দুর্বল করবার জন্যে জার্মান সৈন্যরা মেতে ওঠে বর্বরতার সীমা-ছাড়ানো নির্যাতনে। *অশরীরী* উপন্যাসে শত্রুশিবিরে আম্বিয়ার চোখের সামনে ঘটে পাকিস্তানি হানাদার-বাহিনীর অকল্পনীয় বর্বরতা যা দেখে প্রকৃতিস্থতা ঠিক রাখা দুরূহ। ঔপন্যাসিকের বর্ণনা থেকে উদ্ধৃতি–

> চোখের পলকে মেয়েটিকে মেঝের ওপর শুইয়ে ফেলে জলিলি। বুট দিয়ে একটা পা মেঝের সঙ্গে চেপে রেখে অপর পা-টি ধরে টান মারে; চড়চড় করে একটা শব্দ হয়, সেই সঙ্গে মর্মান্তিক চিৎকার। খুব সহজে, একটা নরম ঘৃতকুমারির পাতার মতো গলা পর্যন্ত দু'ফালি করে ফেলে। ... ঘটনার আকস্মিকতায় আম্বিয়া পাথর হয়ে যায়। সন্ধ্যার পরেও মেয়েটির রক্তাপ্লুত দু'টি ফালি দরোজার সামনে পড়ে থাকে, সে ঘড়ির দু'টি কাঁটা, পাঁচটা বেজে পঁয়ত্রিশ; কিন্তু সকাল বা সন্ধ্যার কথা একবারও মনে আসে না আম্বিয়ার। (মাহমুদুল, ২০১০ : ৭৭)

এমনসব ভয়ংকর জীবনবিরোধিতা আর প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও আম্বিয়া নিজেকে রক্ষা করার লড়াই করে যায়। রক্ষা শত্রুর হাত থেকে নয়, নিজের পতনের সম্ভাবনার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা। একপর্যায়ে আম্বিয়া তার মানসিক দেহের বাইরে তার চেতনাকে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়। স্মৃতির মধ্য দিয়ে সে তার পেছনের জীবনটাকে দেখে এবং বুঝতে পারে সে আসলে কোনোভাবেই নিজের ভেতরকার সুপ্ত শক্তিকে কোনো প্রকারের পরীক্ষার সম্মুখীন করেনি। সে কেবল সবকিছুর সঙ্গে মানিয়ে চলেছে। কিন্তু যুদ্ধ কোনো মানিয়ে নেওয়ার ব্যাপার নয়, যুদ্ধ মানে হলো থাকা বা না-থাকা। অবরুদ্ধ আম্বিয়া শেষ পর্যন্ত তার অস্তিত্বের শক্তিকে প্রতিষ্ঠা করে। সে জানে তার মৃত্যু আসন্ন, কিন্তু প্রতি মুহূর্ত এক নিষ্প্রাণ কিন্তু স্বপ্রাণ-জীবনবাদী হয়েই সে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখছে সেই আসন্ন মৃত্যু থেকে। ক্যাম্পের চরম দুর্দিনেও নিশ্চুপ-থাকা ভীরু-কাপুরুষ আম্বিয়া তার অন্তর্গত দহন থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছে 'আচ্ছন্নতা কি মনোরম' (মাহমুদুল, ২০১০ : ৫৬) বলে চেতনার ঊর্ধ্বে গিয়ে। আচ্ছন্নতার আবেশে আম্বিয়া সমস্ত অকহতব্য ঘটনাসমূহ এড়িয়ে যেতে চেয়েছে, কিন্তু উপন্যাসের সমাপ্তিতে হাতপা বাঁধা

এই কিশোরদলের আবির্ভাব ও তাদের কবরখোঁড়ার কাজই যেন তাকে তার চিরপরিচিত সেই আচ্ছন্নতার খোলসের মাঝেই ফিরিয়ে দেয় তার বোধকে—

> গর্তের খুব কাছেই জন-পনেরো কিশোর মাটির উপর বসে; তাদের হাতও পিছমোড়া করে বাঁধা, মুখও। পাহারাদারদের একজন ফুক ফুক করে টর্চের আলো ফেলে একে-একে সকলের মুখ দেখে; আতঙ্কে সকলের চোখ বিস্ফোরিত।...
>
> আম্বিয়ার পাছায় একটা লাথি পড়ল ধপাস করে, 'কোদাল মার শালা, কোদাল মার!' গর্ত থেকে উঠে আসে আম্বিয়া। আচ্ছন্নতা কি মনোরম, মন তোলপাড় করে একথা। আচ্ছন্নতা কি মধুর! সারা শরীর উৎকর্ণ হয়ে বলে— আমাকে আচ্ছন্নতা দাও! হাঁটু গেড়ে বসে দুহাত জোর করে আম্বিয়া বললে, 'আমাকে গুলি করে মারুন— (মাহমুদুল, ২০১০ : ৭৮—৭৯)

যখনই বিরূপ পরিবেশ পেয়েছে তখনই আম্বিয়ার শরীর ও আত্মা একে অন্য থেকে বিযুক্ত হয়ে দ্বৈত সত্তার আশ্রয় নিয়েছে। আত্মাহীন শরীর পরিণত হয়েছে কাঠের পুতুলে, জাগতিক নির্মমতায়ও যা ছিল পুতুলবৎ নিশ্চল। আর আচ্ছন্নতায় আবিষ্ট হয়ে তার আত্মা কিংবা বোধ সমস্ত নেতির ঊর্ধ্বে তুলে তাকে অশরীরী বানিয়েছে— যে বোধ আচ্ছন্নতায় মুক্তির পথ খুঁজতে পালিয়ে বেড়ায়। সমস্ত উপন্যাসেই অস্তিত্বের লড়াইয়ে আত্মরক্ষণের উপায় সে খুঁজেছে আচ্ছন্নতায়। অথচ উপন্যাসের শেষে এই আচ্ছন্নতাই তাকে তার অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। আচ্ছন্নতা তার বোধ হয়ে জাগ্রত হয় কিশোরদলের ভয়ার্তচোখের হাহাকার দেখে, যাদের কবর খোঁড়ার কাজে সে নিয়োজিত ছিল। আম্বিয়া নিজের জীবনের জামিন পেয়েছিল কবর খোঁড়ার কাজের বিনিময়ে এবং আম্বিয়া এই কাজে বরং জীবন সম্পর্কে নিশ্চিন্তও থেকেছে। পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক ধৃত এই কিশোরদলের আসন্ন মৃত্যু পরিণতি পেতে যাচ্ছিল আম্বিয়ার খোঁড়া কবরের মধ্যেই আর সেই আসন্ন মৃত্যুই তার মাঝে জাগিয়ে তুলেছিল চৈতন্য আর করে তুলেছে শরীরী। কবর খোঁড়ার কাজে ইস্তফা দিয়ে এতদিন ধরে ঘুমন্ত, ভীরু, কাপুরুষ আম্বিয়া 'আমাকে গুলি করে মারুন' (মাহমুদুল, ২০১০ : ৫৬) কথাটির মাধ্যমেই হয়ে ওঠে এক জাগ্রত শরীরী সত্তা, হয়ে ওঠে সাহসী। এখানেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র *চাঁদের অমাবস্যার* আরেফ আলী, আলব্যের কামুর *আউটসাইডার*-এর মার্সো আর *অশরীরী*র আম্বিয়া একই প্রেক্ষণবিন্দুতে আবর্তিত হয়। নিজের শরীরের বিনিময়ে শরীরী হয়ে ওঠা, অস্তিত্বের বিনিময়ে অস্তিত্ববান হয়ে ওঠা আম্বিয়া মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ না করেও হয়ে ওঠে মুক্তির এক সাহসী যোদ্ধা, অনন্য এক শরীরী সত্তা।

মাহমুদুল হকের মুক্তিযুদ্ধ-ধারার উপন্যাস তাঁর অন্যান্য উপন্যাস থেকে কেবল বিষয়, চেতনার দিক থেকেই আলাদা নয়, শিল্পান্বেষার দিক থেকেও আলাদা। তাঁর মনস্তাত্ত্বিক ধারার উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই একাকী, নিঃসঙ্গ, স্মৃতি-আচ্ছন্ন মানুষদের। তাদের একাকিত্ব, নিঃসঙ্গতা, বিচ্ছিন্নতা, স্মৃতিবিধুরতা অকারণ নয়। জীবন-বাস্তবতা ধারার উপন্যাসে শঠ-প্রতারক-স্বার্থবাজ ব্যক্তি এবং বৈরী প্রতিবেশের প্রাধান্য। ব্যক্তির জন্য, সমাজের জন্য সর্বোপরি জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে মানুষ যা ভাবতে পারে, যা করতে পারে তার নানা মাত্রা শব্দের নির্মাণে গড়ে দেখিয়েছেন মাহমুদুল হক। মুক্তিযুদ্ধ ধারার উপন্যাসে এসে তিনি তাঁর নিজস্ব ধারার মধ্যেই সৃষ্টি করেন নতুনতর অন্বেষা। তাঁর মুক্তিযুদ্ধ ধারার উপন্যাসের দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তাঁর উপন্যাসের শিল্পনির্মিতির চেতনায় প্রাসঙ্গিক। ১৯৭২ সালে স্বাধীনতা-লাভের পরপর মুক্তিযুদ্ধের বিষয়াশ্রিত উপন্যাস-রচনা মাহমুদুল হকের জন্য ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু ১৯৭৮—১৯৭৯ সালে পর-পর দুটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস-রচনার মধ্যে নিহিত রয়েছে মাহমুদুল হকের নিজের

সৃজনশীল সত্তার জন্য এবং তাঁর উপন্যাসের মানুষজনের জন্যেও সংগ্রাম। ১৯৭৫ সালের পরবর্তী বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট সমগ্র দেশে সৃষ্টি করে অবরুদ্ধতা। ব্যক্তির শুভ বোধ ও উপলব্ধি প্রকাশের অবকাশ না পেয়ে হয়ে যায় নিয়ন্ত্রণের বৃত্তাবদ্ধ। সেই অবরুদ্ধ ও পরাধীন প্রতিবেশে চেতনাকে জাগ্রত করে নতুনভাবে কর্তব্যবোধ অনুভব করবার অবকাশ তৈরি হয়। কিন্তু সেই কর্তব্য অনুভব করাটাই বড়ো নয়, কর্তব্যকে কাজে পরিণত করাটাই ছিল মুখ্য। কেননা, কর্তব্যকে বোধের সীমা থেকে কর্মের বিন্দুতে নিয়ে যাওয়ার পথ ছিল দুর্গম এবং ঝুঁকিপূর্ণ। ১৯৭৫ সাল পরবর্তী পরিস্থিতিতে মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধকে ক্রমশ অপসৃত করে দেওয়া হচ্ছিল সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক কৌশলে। ধর্মীয় উন্মাদনাকে উস্কে দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে আঘাত করার ষড়যন্ত্রও চলে সমান্তরালে। সেই দুর্গম-ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় মাহমুদুল হক তাঁর চেতনাকে শাণিত করে হয়ে উঠলেন অস্তিত্ববান। তাঁর মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস তাই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সত্তাকে হুমকির হাত থেকে রক্ষা করে তাকে দায়িত্ববান করে তোলার অস্ত্র। *খেলাঘর* উপন্যাসের মুক্তিযোদ্ধা মুকুল এবং *অশরীরী* উপন্যাসের আম্বিয়া সেই দায়িত্ববোধের আলোকপ্রাপ্ত সন্তান। আম্বিয়া সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যে তার সত্তাকে বিলীন হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করেছে। মাহমুদুল হক বাংলাদেশের প্রচণ্ড অস্তিত্ববিরোধী প্রতিবেশে নিজের সত্তাকে রক্ষাই শুধু করেননি, তাকে সক্রিয় করে অস্তিত্বের অর্থবহতার দিকে নিয়ে গেছেন। অনু থেকে আম্বিয়া—এরকম একটি রেখাপথের স্রষ্টা মাহমুদুল হকের যাত্রা একটি শৈশব থেকে নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে একটি বৃহত্তর জৈবনিক প্রেক্ষাপটের অভিমুখে। মাহমুদুল হকের ঔপন্যাসিক সত্তার ক্রমবিকাশ ঘটেছে ব্যক্তিনিষ্ঠতা থেকে সামষ্টিক চেতনার লক্ষ্যে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তাঁর সেই লেখক-শিল্পীসত্তার অস্তিত্বের অগ্নিপরীক্ষা। সেই পরীক্ষায় তাঁর উপন্যাসের আম্বিয়া চরিত্রের মতো স্বয়ং মাহমুদুল হকও পরাভব না-মানা এক ঋজু সংশপ্তক।

সহায়কপঞ্জি

বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০১১)। 'বিযুক্ত জীবন আর বিপন্ন বোনের আখ্যান'। *ঊষালোক* (নব পর্যায়ে, ষষ্ঠ সংখ্যা), সম্পাদক : মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ।

মহীবুল আজিজ (২০১৪)। 'খোকা ও তার উন্মত্ত সময়'। *গল্পকথা*, মাহমুদুল হক সংখ্যা (৪র্থ বর্ষ ৫ম সংখ্যা), সম্পাদক : চন্দন আনোয়ার।

মাহমুদুল হক (২০০৪)। *খেলাঘর*। সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

মাহমুদুল হক (২০০৫)। *জীবন আমার বোন*। সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

মাহমুদুল হক (২০১০)। *অশরীরী*। সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

রশীদ করীম (২০০৩)। *প্রবন্ধ-সমগ্র*। সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

শহীদ ইকবাল (২০১১)। 'জীবন আমার বোন : আখ্যানের চুম্বকশক্তি'। *ঊষালোক* (নব পর্যায়ে, ষষ্ঠ সংখ্যা), সম্পাদক : মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ।

শুভদীপ মিত্র (২০১৪)। "'অশরীরী' : মৃত্যু উপত্যাকায় হারানো অশরীরী মানুষের কথা"। *গল্পকথা* (৪র্থ বর্ষ ৫ম সংখ্যা, মাহমুদুল হক সংখ্যা), সম্পাদক : চন্দন আনোয়ার।

সৈয়দ আজিজুল হক (২০১৪)। 'জীবন আমার বোন : এক বিকল্প নন্দন'। *গল্পকথা*, মাহমুদুল হক সংখ্যা (৪র্থ বর্ষ ৫ম সংখ্যা), সম্পাদক : চন্দন আনোয়ার।

হরিশংকর জলদাস (২০১২)। 'মাহমুদুল হকের খেলাঘর' = যাতনা>প্রেম>গ্লানি>মুক্তিযুদ্ধ'। *বাংলা সাহিত্যের নানা অনুষঙ্গ*। রোদেলা, ঢাকা।